সাতদিন

২৮ জুন : বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বাংলা ভাইসহ বিভিন্ন মৌলবাদীদের তৎপরতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ট্রাক দুর্ঘটনায় ১৮ জন নিহত হয়েছেন।

২৯ জুন : বিভিন্ন পণ্যের শুল্ক কাঠামো সংশোধন করে জাতীয় সংসদে অর্থবিল-২০০৪ পাস হয়েছে।

খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক হুমায়ুন কবির বালু হত্যার প্রতিবাদে খুলনায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত।

৩০ জুন : প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদে ২০০৪-'০৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পাস হয়েছে।

১ জুলাই : ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে চারদলীয় জোট প্রার্থী মোসাদ্দেক আলী ফালু নির্বাচিত হয়েছেন। একই সঙ্গে নির্বাচনে বিকল্প ধারা বাংলাদেশের প্রার্থী মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নান রমনা ও তেজগাঁওয়ে ১০৩টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৮৯টি কেন্দ্রেই ভোট ডাকাতির অভিযোগ করেছেন।

২ জুলাই : সাভারের নয়ারহাটে কোটি টাকার ভারতীয় পণ্যসহ দুটি ট্রাক আটক করা হয়েছে।

৩ জুলাই : প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের আহ্বানে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়েছে।

৪ জুলাই : তিন মিনিটের জন্য আওয়ামী লীগের ওয়াকআউট।

ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরের ছয় মাস আগে আত্মহত্যার খবর। কিন্তু র‍্যাব দিনভর অনুসন্ধান চালিয়েও এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়।

হরতাল নিষিদ্ধ
প্রয়োজন ঐকমত্য

লিখেছেন : **জয়ন্ত আচার্য**

সংবিধানে আবারও সংশোধনী আনা হচ্ছে। ৪ জুলাই সরকার হরতাল নিষিদ্ধকরণ এবং একটানা ৩০ দিন সংসদে অনুপস্থিত থাকলে সংসদ সদস্য পদ বাতিল সংক্রান্ত সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধন বিল প্রণয়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সরকারের একতরফা এ সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক মহলে সৃষ্টি হয়েছে তোলপাড়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একতরফাভাবে হরতাল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত দেশে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন।

হরতাল প্রতিবাদ প্রকাশের একটি ভাষা। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। স্বাধীনতার আগে হরতাল কর্মসূচি পাকিস্তান সরকারের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর হরতালকে বিরোধী রাজনৈতিক দল তুচ্ছ ঘটনার প্রতিবাদ হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর দেশে ১২৩৫ দিনই হরতালে কেটেছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তী তিন বছরই কেটেছে হরতালে। হরতাল পালন করতে গিয়ে দেশে ২৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনের পূর্বে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট ১৮৬ দিন হরতাল পালন করেছে। বর্তমান জোটের শাসনামলে আওয়ামী লীগ ৩৯ দিন হরতাল করেছে। সর্বশেষ ৪ জুলাই আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের ডাকে হরতাল পালিত হয়।

বিগত এক যুগ ধরে হরতাল কর্মসূচি সত্যিকারভাবে রাজনৈতিক আবেদন হারিয়েছে। এখন হরতালের প্রতি রাজনৈতিক

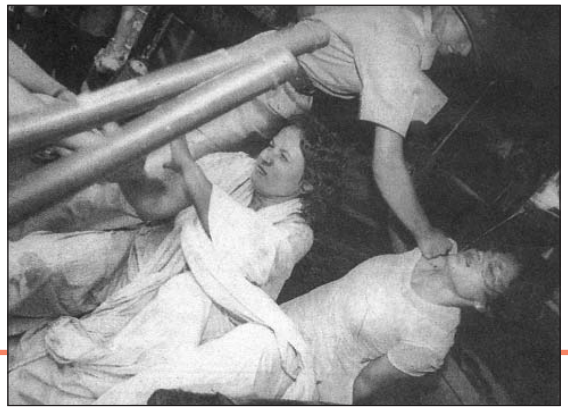

দেশ স্বাধীন হয়েছে ৩২ বছর। অথচ আমাদের অর্জন সামান্যই। এখন দেশের ৬০ ভাগ লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা আরো পুঞ্জিভূত হচ্ছে

নেতা-কর্মীদেরও আস্থা নেই। বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে বিএনপি সরকার পতনের লক্ষ্যে একের পর এক হরতাল ডেকেছে। এ হরতাল ফলদায়ক হয়নি। হরতালের পিকেটিং সীমাবদ্ধ থেকেছে নয়া পল্টনের বিএনপি অফিসের সামনে। এখন আওয়ামী লীগ হরতাল ডেকেছে, এ চিত্রও অনুরূপ। হরতাল, পিকেটিং এখন সীমাবদ্ধ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ও রাসেল স্কোয়ারে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপির ডাকা হরতালের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ বক্তব্য রেখেছে। বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপিকে দেশের অর্থনীতির স্বার্থে হরতাল থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিরোধী দল রাজি থাকলে হরতাল বিরোধী আইন হতে পারে।

এখন ক্ষমতায় বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট। এ জোট হরতালের বিরুদ্ধে সোচ্চার। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে

> স্বাধীনতার পর দেশে ১২৩৫ দিনই হরতালে কেটেছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তী তিন বছরই কেটেছে হরতালে। হরতাল পালন করতে গিয়ে দেশে ২৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে

আলোচনা না করেই হরতাল নিষিদ্ধ করার জন্য সংবিধান সংশোধনী করতে যাচ্ছে। কার্যত দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধী দলে থাকলে হরতাল দিচ্ছে। ক্ষমতায় গেলে হরতাল বিরোধী কথা বলছে।

গত প্রায় তিন বছরে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিএনপি নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করেছে। সংবিধানে ইতিমধ্যে অপ্রয়োজনীয় একটি সংশোধনী আনা হয়েছে। এখন হরতাল নিষিদ্ধ করা ও সংসদে ৩০ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে সংসদ সদস্যদের সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত সংশোধনী বিল আনছে। অথচ তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করেনি। সরকারের এ আচরণ গণতান্ত্রিক শিষ্ঠাচার বিরোধী। সরকার এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গেলে দেশ সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাবে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে ৩২ বছর। অথচ আমাদের অর্জন সামান্যই। এখন দেশের ৬০ ভাগ লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা আরো পুঞ্জিভূত হচ্ছে। এ দেশটি চিহ্নিত হচ্ছে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে। এখন এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ প্রয়োজন। এ কারণে হরতাল নিষিদ্ধ করার মতো জাতীয় ইস্যুতে সব দলের ঐকমত্য প্রয়োজন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

বার্ন ইউনিট অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা

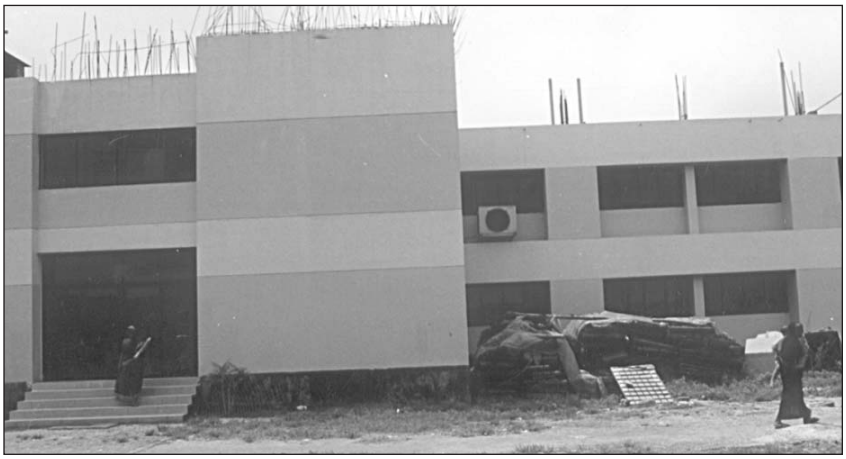

লিখেছেন **পারভীন তানী**

২০ জুন, রোববার। ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগের হাতের বাম দিকে একটু হাটলেই বার্ন ইউনিট। সকাল ১১টায় সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদক পৌঁছায় বার্ন ইউনিটে। সকালবেলায় স্বাভাবিক নিয়মে মানুষজন থাকার কথা। কিন্তু ভেতরে গিয়ে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না বার্ন ইউনিট সম্পর্কে জানার জন্য। এমনকি অনুসন্ধান নামক জায়গাটিও মানুষ শূন্য। ফলে দিকভ্রান্ত হবার মতো অবস্থা। এই সময় একজনকে দেখা গেলো। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম বার্ন রোগীদের ওয়ার্ড কোন দিকে।

ওয়ার্ডে ঢুকে দেখলাম চারপাশে পোড়া রোগী। কেউ আগুনে পোড়া, কেউ এসিডদগ্ধ। একটি বেডে ছোট দুটি শিশু। ওরা দুই ভাই। জমি সংক্রান্ত বিরোধে তাদের ওপর এসিড নিক্ষেপ করা হয়। শিশু দুইটির বড়বোন জানায়, 'এখানে কুমিল্লা থেকে আসতে দেরি হয়ে যায়। ফলে প্রয়োজনীয় সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করতে না পারায় দুই ভাইয়ের অবস্থা খারাপ। তার ওপর কোনো আয় না থাকার কারণে আমাদের সব কাজ নিজেদের করতে হয়।'

গাজীপুরের জেসমিন আক্তার ম্যাচের কাঠি জ্বালাতে গিয়ে সম্পূর্ণ শরীরে আগুন ধরিয়ে ফেলে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের কথা থাকলেও প্রথম দিনেই তাকে কিনতে হয় প্রায় ৩০০০ টাকার ওষুধ। ব্যান্ডেজের কাপড়ও তাদের কিনতে হয় বলে জানান জেসমিনের শাশুড়ি। এখানে উল্লেখ্য, রোগীদের বিশেষ করে পোড়া রোগীদের অবশ্যই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ব্যান্ডেজের কাপড় সরবরাহ করবে।

ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে আসার সময় দেখা গেল ওয়ার্ড সংলগ্ন বাথরুমে অপরিষ্কার পানি জমে আছে। এই পানি জুতা-স্যান্ডেলের মাধ্যমে ওয়ার্ডকে অপরিচ্ছন্ন কাদাময় করে তুলছে। পরিষ্কার করার কোনো লোক নেই। যেখানে পোড়া রোগীদের রাখতে হয় সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্ন। কেননা এই রোগীরা খুব দ্রুত জীবাণুদ্বারা সংক্রমিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে এটাই সত্যিকারের চিত্র বার্ন ইউনিটের। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা, অকার্যকর আইসিইউ, অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা দামী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এসব সমস্যা নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিট চলছে।

প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয় করে এই ইউনিট তৈরি হয়। ৬ তলার ফাউন্ডেশন এবং ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হওয়ার কথা থাকলেও অর্থ স্বল্পতার জন্য তৈরি হয়েছে ৩ তলা পর্যন্ত এবং ৫০ শয্যার। যা রোগীর তুলনায় খুবই কম। এখান থেকেই মূলত বার্ন ইউনিটের সমস্যার শুরু। বার্ন ইউনিটের সহযোগী অধ্যাপক ডা.

‘অব্যবস্থাপনার কারণে এখানে সমস্যা অনেক’

ডা. সামন্ত লাল সেন
পরিচালক, বার্ন ইউনিট
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সাপ্তাহিক ২০০০ : ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। এগুলো কতটুকু সত্য?

ডা. সেন : অনেক স্বপ্ন নিয়ে আন্দোলন করে বার্ন ইউনিটের জন্ম হয়েছে। এপ্রিল মাস থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে এর কাজ শুরু হলেও অব্যবস্থাপনার কারণে এখানে সমস্যা অনেক। তবে আমরা চেষ্টা করছি সমস্যাগুলোর সমাধানে আনতে।

২০০০ : পোড়া রোগীদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অন্যান্য রোগের রোগীদের থেকে বড় ভূমিকা রাখে। সেখানে বার্ন ইউনিটে এই ব্যবস্থার অভাব কেন?

ডা. সেন : আমাদের এখানে প্রয়োজনীয় কর্মচারীর অভাব আছে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জটিলতার কারণে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে আমরা ঠিকমতো পরিষ্কার রাখতে পারছি না।

২০০০ : একটি বার্ন ইউনিট চালু করার জন্য কি কি প্রয়োজন?

ডা. সেন : প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত হাসপাতাল। যেখানে ডাক্তার থেকে শুরু করে সবচেয়ে নিম্ন কর্মচারীকে হাসপাতালে ঢুকতে হলে সম্পূর্ণ আলাদা পোশাক পরতে হবে। যেহেতু এসব রোগী খুবই স্পর্শকাতর সেহেতু বাইরের লোক প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে। এসবের জন্য প্রয়োজন যোগ্য ব্যবস্থাপনা। এ ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে।

শামসুদ্দিন আহমেদ দুইটি মূল সমস্যার কথা বলেন। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, ‘সদ্য নির্মিত এই ইউনিটে সমস্যা দুইটি। এক. শয্যা স্বল্পতা। এবং দুই. প্রয়োজনীয় লোকবলের সীমাবদ্ধতা।’ বাংলাদেশের রোগীর এটা বড় অংশ পোড়া রোগী। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ২ থেকে ৩ জন পোড়া রোগী ভর্তি হয়। তীব্র শয্যা সংকট থাকার কারণে অনেক রোগীকে ভর্তি করা সম্ভব হয় না।

যদিও রোগী ভর্তি হয়, তাকে অনুভব করতে হয় আয়া বা এ জাতীয় অন্যান্য লোকের অভাবে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জটিলতার কারণে রোগীর অভিভাবকদের বাধ্য হয়ে সব কাজ করতে হয়। কাজ করলে বেতন পাবে, কাজ না করলে নয়- সরকারি এই ঘোষণায় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতি ধর্মঘট করে। ধর্মঘট আদালত পর্যন্ত গড়ালে সমস্ত ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। সরকারের সঙ্গে কর্মচারীদের বিরোধের পরিণতি হাসপাতালের রোগী ও তার অভিভাবকদের ব্যাপক দুরবস্থা। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী একটি হাসপাতালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু কোনো প্রকার কর্মচারী নিয়োগ না করে হাসপাতাল চালু করায় সেখানে সৃষ্টি হয়েছে বিশৃঙ্খলার। সহযোগী অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দিন আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, ‘আমাদের এখানে নার্স নিয়োগ করার কথা ৩০ জন। কিন্তু আছে মাত্র ১৮ জন। অন্যদিকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী না থাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে ৮ জন লোককে নিযুক্ত করা হয়েছে। যারা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অভাব মেটানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু এতো অল্প লোক দিয়ে এতোবড় বার্ন ইউনিট চালানো সম্ভব নয়।’ শুধু তাই নয়, স্বল্পতা আছে ডাক্তার নিয়োগে। প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তার যথেষ্ট নয়। রোগীদের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকা ডাক্তার আছেন ৯ জন, অপারেশনের সময় অ্যানেসথেটিকে আছে ৫ জন এবং অনারারী ১ জন। এই ১৫ জন ডাক্তার নিয়ে চলছে বার্ন ইউনিট। ফলে গুটিকয়েক ডাক্তারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোগী পাচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা সেবা।

এছাড়াও বার্ন ইউনিটের বিল্ডিং প্ল্যানিং-এ গলদ আছে বলে জানিয়েছেন ডা. নূরে আলম। বার্ন ইউনিটে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা পড়ে আছে অরক্ষিত অবস্থায় বিল্ডিংয়ের বাইরে। কেননা এগুলো ঢোকানোর মত প্রবেশ পথ বিল্ডিংয়ে নেই। যদিও একথা অস্বীকার করেছেন হাসপাতালের পরিচালক ডা. সেন। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, ‘যে কোম্পানি থেকে এগুলো কেনা হয়েছে তাদের সঙ্গে এখনও কথা চলছে। এই যন্ত্রগুলো বসানোর জন্য জায়গা ঠিক করা হচ্ছে। কেননা এগুলোর জন্য ব্যাপক জায়গার প্রয়োজন।’

ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিট পোড়া রোগীর চিকিৎসার জন্য একটি স্বপ্ন। কিন্তু শুরুতেই এই স্বপ্ন ভেঙে যায়। চরম অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ বার্ন ইউনিট। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হয়। প্রতিবারই জানা যায়, তিনি মিটিংয়ে আছেন। ফলে জানা যায়নি সরকার কেন এই ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।

প্রকৃত তথ্য কী প্রকাশ হবে

মায়ানমারের বিদ্রোহী গ্রুপের দুই সক্রিয় সদস্যকে ১৫ দিনের রিমান্ডে গত ৪ জুলাই সকালে ঢাকায় নেয়া হয়েছে। গত ২ জুলাই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার হয় জন লুইন উইদারজি (৩৮) এবং মে শুন ওরফে খিন মন (৫২)। বাংলাদেশে অবস্থান করে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থ পরিপন্থী বিভিন্ন অপরাধ কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার দায়ে বিমানবন্দর থেকে এ দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। খিন মনের কাছে বাংলাদেশী পাসপোর্ট ছাড়া ব্রিটিশ ও মায়ানমারের পাসপোর্ট রয়েছে। জন লুইন মার্কিন পাসপোর্টধারী। গত ২ জুলাই পতেঙ্গা থানা পুলিশ গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে থাই এয়ারওয়েজের দুই যাত্রী মায়ানমার বংশোদ্ভূত এবং বিদ্রোহী গ্রুপের সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। এ মর্মে পতেঙ্গা থানায় একটি ডায়েরি করা হয়। জিডি নং ৫০। পতেঙ্গা থানার এসআই আবদুল করিম চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বহির্গমন পথে বেরুবার সময় ব্যাংকক থেকে থাই এয়ারলাইন্স টিজি-৩০৯ বিমানে আগত দুই যাত্রীকে গ্রেপ্তার করেন। এ সময় টেলিফোনে ওসি মোঃ জাহিদুল ইসলাম সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আরেকটি জিডি (নং-৫৮ ২/৭/০৪) করা হয় পতেঙ্গা থানায়। বিকেল সাড়ে ৫টায় এ জিডি করা হয়। ওসি জাহিদুল ইসলাম নিজেই এ জিডি করেন। অভিযুক্তদের রিমান্ডে দেয়া হয় আদালত থেকে ৩ জুলাই। ৪ জুলাই সকাল ৭টায় পতেঙ্গা থানা থেকেই ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জন এবং খিন মনকে ঢাকায় পাঠানো হয়। জিডি সূত্রে প্রকাশ, অভিযুক্তদের ৫৪টি ব্যক্তিগত মালামাল জব্দ করা হয়েছে। দু'জনের মধ্যে খিন মনের তিনটি পাসপোর্ট এবং জন লুইনের মার্কিন পাসপোর্ট থাকাতে গোয়েন্দা সংস্থা এবং পুলিশ প্রশাসনের সন্দেহ এরা আন্তর্জাতিক অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান সিন্ডিকেটের সক্রিয় সদস্য। খিন মনের বর্তমান ঠিকানা হ্নীসা, চৌধুরীপাড়া, টেকনাফ, জেলা কক্সবাজার । পুলিশের বিশেষ গোয়েন্দা শাখা ও নগর গোয়েন্দা শাখা এবং পতেঙ্গা পুলিশের সহায়তায় জয়েন ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদের পর অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ এবং জোর তদন্তের স্বার্থে জয়েন ইন্টারোগেশন সেল ঢাকায় এনে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, শেষ পর্যন্ত এ তদন্তের ফলাফল প্রকাশিত হবে কি? এই দুই অভিযুক্তের প্রকৃত তথ্য জনগণ জানতে পারবে তো?

চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

বাংলাফোন আসছে শিগগিরই

লিখেছেন বদরুল আলম নাবিল

সরকার ৪টি বেসরকারি কোম্পানিকে ফিক্সড ফোনের ব্যবসা করার লাইসেন্স দিয়েছে। এরা হলো র‍্যাংগস, বাংলাফোন, বসুন্ধরা এবং জালালাবাদ। আরো কয়েকটি কোম্পানি সহসা লাইসেন্স পেয়ে যাবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

দেশের মানুষের টেলিফোন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ সরকারের টিএন্ডটি বোর্ড। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এখনও এ দেশে একটি ল্যান্ড ফোনের মালিক হওয়া যেন সোনার হরিণ পাওয়া। একটি ফোনের জন্য টাকা জমা দিয়ে ২৭ বছর অপেক্ষার পরও ফোন পাওয়া যায়নি এমন ঘটনাও ঘটেছে। মোটা অঙ্কের উৎকোচ দেয়ার পরও ফোন পেয়ে অপেক্ষা করতে হয় বছরের পর বছর। লাইন পাওয়ার পরও ফোনে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সারাতে আবার দুর্ভোগ পোহাতে হয় গ্রাহকদের। এ প্রেক্ষিতে দাতাগোষ্ঠীর চাপ এবং বিভিন্ন মহল থেকে দাবি ওঠে ল্যান্ড ফোনের ব্যবসায় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের হাতে ছেড়ে দেয়ার।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ৪টি কোম্পানির মধ্যে বাংলাফোন জোরেশোরে প্রচারণা শুরু করেছে। সূত্র জানিয়েছে, চলতি বছরের শেষ দিকে থেকে বাংলাফোন গ্রাহকদের সংযোগ প্রদান শুরু করতে পারবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। এ প্রেক্ষিতে আমরা বাংলা ফোনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমজাদ খানের সঙ্গে কথা বলি। সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ নিম্নরূপ :

‘সংযোগ ফি, কল চার্জ এবং মাসিক চার্জ টিএন্ডটি ফোনের চেয়ে কম হবে’

আমজাদ খান *এমডি, বাংলা ফোন*

সাপ্তাহিক ২০০০ : কবে নাগাদ বাংলা ফোনের সংযোগ পাচ্ছে গ্রাহকরা?

আমজাদ খান : ব্যবসায়িক কৌশলের কারণে বিষয়টি এখনই প্রকাশ করতে চাচ্ছি না। তবে খুব শিগগিরই সংযোগ দেয়া শুরু করতে পারবো। পুরোদমে কাজ চলছে। আমরা যে ১৬টি জেলার লাইসেন্স পেয়েছি সেগুলোর শহর, বন্দর, বাজারে এজেন্ট নিয়োগ চলছে। এজেন্টদের ট্রেনিং দিয়ে টেলিফোন বিজনেসের দক্ষতা বাড়ানোর কাজ চলছে।

এখানে একটি কথা বলতে চাই। আমরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি এজেন্ট নিয়োগের কথা বলে। আসলে আমরা এদের এজেন্ট বলতে চাই না। এরা আমাদের ব্যবসায়িক পার্টনার। পার্টনার টার্মটা এ দেশের মানুষের কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয়। তাই এজেন্ট শব্দটা ইউজ করতে বাধ্য হয়েছি।

২০০০ : টিএন্ডটি ফোনের পরিবর্তে আমরা কেন বাংলাফোনের সংযোগ নেব?

আমজাদ খান : প্রথম কারণ হচ্ছে সহজলভ্য। আমরা তিন পদ্ধতিতে সংযোগ প্রদান করবো। যেদিন সংযোগ চাইবে সেদিনই যদি গ্রাহক সংযোগ চায় তবে আমরা ওয়ারলেস সিস্টেমে ডাকে সংযোগ দেব। সেজন্য তার বাড়িতে যেসব যন্ত্রপাতি বসাব তার খরচ গ্রাহককে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত ৭ দিনের মধ্যে সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা জরুরি ভিত্তিতে তার টেনে সংযোগ দেব। এ ক্ষেত্রেও কিছু অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে। আর গ্রাহকদের যদি তাড়া না থাকে তবে ৩০ দিনের মধ্যে আমরা সংযোগ দেব। টিএন্ডটি ফোনে গ্রাহকদের যে ভোগান্তি পোহাতে হয় তা থাকবে না। কাউকে উৎকোচ দিতে হবে না। টেলিফোনে কোনো সমস্যা দেখা দিলে অভিযোগ জানানোর ১ ঘন্টার মধ্যে আমরা ঠিক করে দেব।

আমরা মডার্ন কম্পিউটারাইজ পদ্ধতি ব্যবহার করবো। এতে আমি হেড অফিস অথবা জোনাল অফিসে বসেই সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পাবো গ্রাহকদের লাইনে সমস্যা কেন হলো। কম্পিউটার বলে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেরে ফেলা সম্ভব হবে। অভিযোগ জানানোর জন্য আমাদের টেলিফোন নম্বর থাকবে যাতে গ্রাহক তার প্রতিবেশীর ফোন থেকে যখন-তখন অভিযোগ জানাতে পারে।

২০০০ : সংযোগ ফি, কল চার্জ এবং মাসিক চার্জ কেমন হবে?

আমজাদ খান : সবগুলোই টিএন্ডটি ফোনের চেয়ে কম হবে। সেভাবে আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি টেলিফোন রেগুলেটরি কমিশনের কাছে। অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত বলাটা ঠিক হবে না।

২০০০ : আপনারা যে এজেন্ট বিজনেস পার্টনারদের নিয়োগ করেছেন তার কাজ কি? কি যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিচ্ছেন?

আজমাদ খান : আমরা গ্রামে-গঞ্জে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন করছি। এ এক্সচেঞ্জগুলো তাদের দায়িত্বে থাকবে। তাদের কিছুটা শিক্ষা থাকতে হবে এবং আর্থিক সামর্থ্যও কিছুটা থাকতে হবে।

২০০০ : আপনারা এই ১৬ জেলায়

কতগুলো ফোন সংযোগ দেবেন এবং কতদিনের মধ্যে?

আমজাদ খান : আমরা ১ লাখ সংযোগ দেব। টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন বলেছে ৫ বছরের মধ্যে ১০ হাজার সংযোগ দিতে। তার আগেই আমরা এ লক্ষ্য পূরণ করতে পারবো।

২০০০ : আপনারা কতো কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন? এর মধ্যে বিদেশী বিনিয়োগ কত?

আমজাদ খান : ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবো। এর মধ্যে অর্ধেক বিদেশী। আমার দু'জন পার্টনার আছেন। একজন স্টিলের মতলুব সাহেব, অন্যজন টেকনো হেভেনের হাবিবুল্লাহ করিম। দেশী বিনিয়োগ ওনাদের আর বিদেশীটা আমার।

২০০০ : আপনি তো বাংলাদেশী?

আমজাদ খান : আমি বাংলাদেশেরই গ্রামের ছেলে। আমার বাড়ি ঢাকার অদূরে ঘোড়াশালে। আমি পড়াশুনা করেছি আমেরিকায়। এখন ওখানে ৩টি ব্যবসা আছে। এর মধ্যে একটি এরকম বেসরকারি টেলিফোন কোম্পানি, যার নাম বিসিআই। এছাড়া কম্পিউটার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ফার্ম এবং ডেভেলপার কোম্পানি আছে।

২০০০ : শুনেছি আপনি নিজে টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার?

আমজাদ খান : হ্যাঁ, আমি সার্টিফায়েড ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার এবং সফট্ওয়্যার এনালিস্ট।

২০০০ : আমেরিকার অভিজ্ঞতা এখানে আপনি কিভাবে কাজে লাগবেন?

আমজাদ খান : আমার সঙ্গে আরো ৩টি কোম্পানি যে লাইসেন্স পেয়েছে, তাদের টেলিফোন বিজনেসে অভিজ্ঞতা নেই। তাদের সবকিছুই করতে হবে লোক হায়ার করে। আমার তা করতে হবে না। আমার লোকরাই এসে সবকিছু করে দিয়ে যাবে।

২০০০ : মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিগুলো এখানে ভালো ব্যবসা করছে। কিন্তু মোবাইল কোম্পানিগুলো সম্পর্কে এ দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। মাত্রাতিরিক্ত কলচার্জ তারা নিচ্ছে। আরো নানা ফাঁকফোকর খুঁজে গ্রাহকদের টাকা হাতাচ্ছে। বাংলা ফোনও সে রকম করবে?

আমজাদ খান : তা করবে না। আমরা কলচার্জ নেব পয়সায়, টাকায় নয়। আমরা টাকা হাতানোর ফাঁক ফোক খুঁজবো না। আমরা চেষ্টা করবো বাড়তি কোনো সুবিধা গ্রাহককে দিয়ে আয় বাড়াতে। যেমন আমরা ইন্টারনেট সুবিধা দিলে গ্রাহকরা ব্যবহার করলে আমাদের আয় বাড়বে। সার্ভিস ইজ দ্য নেম অব দ্য গেম। এখানে মোবাইল ফোনের রেট খুবই বেশি।

এই মোবাইলটি আমেরিকান (একটি সেট দেখিয়ে)। ১০০ ডলার দিয়ে আমেরিকার মতো জায়গায় ৪ হাজার মিনিট কথা বলতে পারি, এখানে মোবাইল কল চার্জ আমেরিকার চেয়েও বেশি। এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা।

বাংলাফোনে আরো একটি সুবিধা থাকবে থ্রি ওয়ে কলিং সুবিধা। আপনি একসঙ্গে দু'জনের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। ৩ জনই পরস্পরের কথা শুনতে পারবে।

২০০০ : আমাদের দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এসে অনুমতি পেতে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?

আমজাদ খান : আমার তেমন বেগ পেতে হয়নি। বিটিআরসির কর্মকর্তারা খুব সহযোগিতা করেছে। তারা খুব আন্তরিকভাবেই আমাকে সহায়তা করেছে।

২০০০ : আপনাদের ১৬টি জেলা কোনগুলো?

আমজাদ খান : আমরা লাইসেন্স পেয়েছি নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলবীবাজার এবং ঢাকা জেলা। ঢাকা মহানগর, জিঞ্জিরা, সাভার, টঙ্গি বাদে।

চট্টগ্রাম

আবারো আক্রান্ত সাংবাদিক

চট্টগ্রামে গত ১ জুলাই সন্ত্রাসী হামলায় আক্রান্ত হন দৈনিক ভোরের কাগজের ফটোসাংবাদিক সোহেল রানা। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে পেশাদার সন্ত্রাসীরা সোহেল রানাকে নগরীর 'ওয়ার সেমেট্রি' এলাকায় সিএনজিতে তুলে নিতে ব্যর্থ হয়ে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে ক্র্যাকার ছুঁড়ে চলে যায়। সোহেলকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়া ক্র্যাকারের স্প্লিন্টার এবং ছুরিকাঘাতে মারাত্মক আহত সোহেল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ২৬ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। সোহেল রানা '৯৯ থেকে ফটোসাংবাদিকতায় যুক্ত। তিনি বিভিন্ন সময় পেশাগত কাজে রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং সন্ত্রাসী হামলার ছবি তুলেছেন। নগরীর চিহ্নিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর টার্গেটে পরিণত হয়েছেন কি সোহেল? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে ঘটনার ভয়াবহতা থেকে। গত ২৭ এপ্রিল একইভাবে আক্রান্ত হন সাপ্তাহিক ২০০০-এর চট্টগ্রাম প্রতিনিধি সুমি খান। চরম নিরাপত্তাহীনতায় চট্টগ্রামের সাংবাদিকরা উদ্বিগ্ন।

আমীর হুমায়ুন মাহমুদ চৌধুরী *সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স*

চট্টগ্রামে এখন সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, ছাত্র কেউই নিরাপদ নয়। এ পরিস্থিতিতে পুলিশ কী করছে আমি জানি না। ইদানীং মাদকাসক্তি বেড়ে গেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। এখানে মাদকাসক্ত যুবক এবং পেশাদার সন্ত্রাসী দুটো গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রামে সন্ত্রাস হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন বাজারে লাঠি-বাঁশি সমিতির মতো কমিটি করে দিচ্ছি- যা জনপ্রতিরোধমূলক ভূমিকা নেবে। এ ছাড়া কোনো পথ দেখছি না। যতো দিন যাচ্ছে আমরা ততই বিপন্নবোধ করছি। সাংবাদিকরাও আমাদেরই একজন।

আবু সুফিয়ান *চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব*

'বিচার পাই না বলে বিচার চাই না'। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এ স্লোগান। দেশে সুশাসন নেই বলেই জনগণ আজ বিপন্ন। একটা মহল চাইছে সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করতে। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের বিকল্প নেই। কোনো অবস্থাতেই সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব থেকে সরাতে পারবে না। ক্রমাগত বিপন্ন বোধ করছি। উদ্বিগ্ন হচ্ছি আমরা। চট্টগ্রামে সংবাদপত্রসেবী ঐক্য পরিষদ আছে- এ ব্যানারে আমরা একসঙ্গে প্রতিরোধ করতে চাই সব অপশক্তিকে।

প্রশাসনের সতর্কতা বাঁচিয়ে দিতে পারে অনেক প্রাণ, সচল করতে পারে নাগরিক জীবন। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নগরবাসীর স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। হঠকারী রাজনীতিক, সন্ত্রাসের নেপথ্য হোতাদের এখনই দমন জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষক মহল। মুক্ত সাংবাদিকতার রুদ্ধদ্বার খুলে দেয়া এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি। সোহেলের পরিবার জানলেও মাকে জানানো হয়নি তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে। সোহেল পেশাগত দায়িত্বে ফিরতে পারবেন তো? এ প্রশ্ন আজকে সবার। তাদের এ টুকুই চাওয়া, একটু নিশ্চিন্ত পেশাগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন। চট্টগ্রামের সাংবাদিকদেরও এ ছোট্ট চাওয়া বাস্তবে খুঁজে পাওয়া কঠিন হতো না যদি প্রশাসন দায়িত্ব সচেতন হতো- যা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে এ বিপন্ন সময়ে।

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি